‘মাথায় কত প্রশ্ন আসে দিচ্ছে না কেউ জবাব তার’

জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। ছোটবেলায় কবিতা পড়েছিলাম, ‘মাথায় কত প্রশ্ন আসে দিচ্ছে না কেউ জবাব তার, সবাই বলে মিথ্যে-বাজে বকিসনে আর খবরদার!’ উঠতি যুবক বয়সেও কিছু উদ্ভট ভাবনা-চিন্তা করতাম, কবি সুকুমার রায় যাকে ‘বিষম চিন্তা’ বলেছেন। আমার এক বন্ধু এক পিরের মুরিদ। আমারও ইচ্ছে পিরের মুরিদ হয়ে ভবিষ্যতে কামেল পির হওয়া। সে সন্ধ্যা ও রাতে নামাজের পর জিকির (স্মরণ করা) করে। গলার ভেতর থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ বের হয়ে আসে। অনবরত মাথা উপর-নীচে ঝাঁকাতে থাকে। আমি ভয় পেয়ে যাই। কি জানি মাথার ঘিলু ওলট-পালট হয়ে যায় কী না! একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলাম। ও বললো, জিকির করার আগে নিয়ত করতে হয়। ‘আমি আমার পির কেবলার কলবের (মন, হৃদয়) দিকে মোতাওয়াজ্জেহান আছি, আমার পির তার পির হযরত ...এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহান আছে, তার পির বড় পির আব্দুল... কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহান আছে। বড় পির আব্দুল ... হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কলবের রুহানির (আত্মিক) দিকে মোতাওয়াজ্জেহান আছে। এখন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কলবের রওশনি (দীপ্তি, আলো) আমার কলবে আসুক।’ নিয়তটা আমার খুব ভালো লাগলো। আমি ভাবলাম, এত কলব পেরিয়ে রওশনি আমার কলবে না এনে আমি নিজেই যদি আল্লাহর দেওয়া নিয়ম-নীতি, বিধি নিষেধ মেনে চলি, সরল-সঠিক পথ অনুসরণ করি, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)কে মান্য করি, তাহলে এত পিরের মাধ্যমে কামেল পির হওয়ার প্রয়োজন কী! সরাসরি খাজা-বাবা বা খাজা-দাদা বা খাজা-দাদার-বাবা হওয়া যায়। এর চেয়ে ভালো আর নেই। এর পর থেকে পির ধরার সখ আমার মিটে গেছে।

গত ৪.১০.’২৩ বিবিসি নিউজ বাংলায় পড়লাম “কেউ নিষেধাজ্ঞা দেবে না, তলে তলে আপস হয়ে গেছে– সেতুমন্ত্রী; কোথায় নিষেধাজ্ঞা? কোথায় ভিসানীতি? তলে তলে আপস হয়ে গেছে। দিল্লি আছে। আমেরিকার দিল্লিকে দরকার। আমরা আছি, দিল্লিও আছে। দিল্লি আছে, আমরাও আছি। শত্রুতা কারো সঙ্গে নেই। ... ভারসাম্য সবার সঙ্গে করে ফেলেছেন, আর কোনো চিন্তা নেই।” এ ছাড়াও আরো পড়লাম, “তিনি বলেন, ‘দুই সেলফিতেই বাজিমাত। এক সেলফি দিল্লি, আরেক সেলফি নিউইয়র্কে। শেখ হাসিনা আর পুতুল, জো বাইডেনের সেলফিতে দিল্লিতে বাজিমাত। তারপর নিউইয়র্কে বাজিমাত। কোথায় স্যাংশন, কোথায় ভিসানীতি?’... ‘নিষেধাজ্ঞার হুমকি-ধমকি শেষ’।” (বণিক বার্তা, ৪.১০.’২৩)। দেশের ভোট, দেশের গণতন্ত্র, সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার; আর তলে তলে আপস হবে পিরদের সাথে– এটা কীভাবে সম্ভব? তাহলে এদেশের সাধারণ নাগরিকদের চাওয়া-পাওয়ার মূল্য কোথায়? ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি পির ধরার অভ্যাস এদেশের অনেকের আছে, রাজনৈতিক দলেরও আছে। বড় পির (প্রধান পির)-এর কাছে পৌঁছতে মাঝখানে অনেক পিরের মাধ্যম লাগে, কলবে নুরের পরশ আসা লাগে, অসিলা লাগে। বর্তমান যুগেও সেলফি একটা বড় অসিলা। সবার ভাগ্য ও সুযোগ তো সব সময় সুপ্রসন্ন হয় না। লালন বলেছিলেন, কপালের নাম গোপাল চন্দ্র, কপালের নাম গুয়ে-গোবরে, সকলি কপালে করে’। বলতেই হয়, এদেশের মুরিদ (ভক্ত, চেলা, শিষ্য)-দের কপাল ভালো। কিন্তু সাধারণ মানুষের কপাল এমন ‘গোপাল চন্দ্র’ হলো কেন? আমি তো কোনো দলের সাতে-পাঁচে থাকিনে। যেটা মনে মেনে নেয় না, প্রকাশ করে ফেলি।

সাদাসিধে কথায় রাজনীতির উদ্দেশ্য জনসেবা করা, দেশসেবা করা, দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মজবুত করা, মানুষের কল্যাণ করা, সমাজে সুনীতি প্রতিষ্ঠা করা, সামাজিক বৈষম্য দূর করা, সুশিক্ষিত জাতি গঠন করা ইত্যাদি।

এহেন হরিলুটের মেলা (পত্রিকায় প্রকাশিত) কি জাতি গঠনের অঙ্গীকার? সর্বৈব মিথ্যাচার, দুরাচারবৃত্তি কি সুনীতি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত? জনগণ আমার, তো দেশই আমার। জনগণই রাজনৈতিক দলের প্রধান শক্তি। জনকল্যাণই রাজনৈতিক দলের প্রধান কর্তব্য। আমরা কি এসব কাজে আছি? আমরা পির তোষণে মত্ত। যে রাজনীতি বা রাজনৈতিক দল দেশের মানুষকে সামাজিকভাবে কুপথে চালিত হতে শেখায়, দুর্নীতির ছবক দেয়, জনগোষ্ঠীকে জনআপদ বানানোর প্রশিক্ষণ দেয়, পারস্পরিক প্রতিহিংসা জাগিয়ে তোলে– তাকে কি রাজনীতি বা রাজনৈতিক দল বলা যায়? আমরা সবাই একটা বিষয়ে নিশ্চয়ই একমত যে, এদেশে রাজনীতির নীতিতে খুবই দুর্ভিক্ষ চলছে। রাজনীতির উদ্দেশ্যই পাল্টে গেছে। রাজনীতির চিন্তাধারা থেকে জনগণ হারিয়ে গেছে। পিরের আস্থাভাজন হতে পারলেই যে কোনোভাবে ক্ষমতায় থাকা যায়। আমরা আবার কেমন দেশের জনগণ হলাম! 'যার ঘোড়া তার ঘোড়া নয়, চেরাগ আলীর ঘোড়া।' পির সন্তুষ্টির ঘোড়া। পির খুশি তো রাজত্ব খুশি। সে-কথা আবার হাসি মুখে ফলাও করে প্রকাশ করি। ভাবতেও অবাক লাগে, রাজনীতিতে লোকলজ্জা ও আত্মজিজ্ঞাসাও হারিয়ে গেছে। দেশ, জনগণ ও গণসমর্থনের দিকে কোনো লক্ষ্য নেই। লক্ষ্য পির খুশি তো আমি খুশি, আমার ক্ষমতা বলবৎ, পির আমাকে রক্ষা করবে। সাধনা, 'পিরের কলবের (মনের) রওশনি (দীপ্তি, আলো) আমার কলবে আসুক'। তাহলেই আমি সুরক্ষিত। আমার এ কথায় কারো সম্বিত ফিরে আসবে কি না? পত্রিকার পাতা জুড়ে অনেক প্রাবন্ধিক বার বার একই কথা লিখে তো কোনো লাভ নেই– যদি এমনটিই হয়, 'কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো'– তাহলে আমাদের সাধারণ মানুষের মতামত দেওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার কোথায়? আমরা সংবিধানের দোহায় দিচ্ছি। সংবিধান কে পরিবর্তন করেছে? আজ এ কথা বলতে পারার অজুহাত দেখাতে ইচ্ছে করেই আগে পরিবর্তন করেছি। কারো এত সহজ কথাটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়?

আমার এক বন্ধুবর ইঞ্জিনিয়ার ভাই শেষ বয়সে 'দৈনন্দিন ন্যূনতম ইবাদত' নামে একটা বই লিখেছেন। আমাকে পড়তে দিয়েছেন। এক জায়গায় দেখলাম ' জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাওয়ার দু'য়া'। বাংলা অর্থ এরকম: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই'। এটা নিছক ইচ্ছা ব্যক্ত করা। এটা নামাজের পর বার বার তসবিহ পড়তে হবে। পড়ে খুব ভালো লাগলো। ইচ্ছা ব্যক্ত করে, দু'য়া পড়েই যদি জান্নাত পাওয়া যায় এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচা যায়, তবে দুনিয়ার এত ভালো কাজ-কাম করার নির্দেশ, খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা, 'সৃষ্টিবিধান' মেনে চলার কী দরকার? কেয়ামতের দিন 'কর্ম-বিবরণী' (আমলনামা; আমল অর্থ কাজ, নামা অর্থ বিবরণী; অর্থাৎ ভালো ও খারাপ কাজের বিবরণী)-এরই বা কী দরকার? দেহে রক্তশূন্যতার জন্য খাবার ও ওষুধ না খেয়ে ঘরে বসে শুধু 'ক্যাপসুল', 'ক্যাপসুল', 'ক্যাপসুল' হাজার হাজার বার তসবিহ জপলেই তো দেহে রক্ত ভরে যাবার কথা। দুনিয়াদারির এত আয়োজনের কী প্রয়োজন ছিল? আমার প্রশ্ন, আমরা কাজের বিনিময়ে, না তসবিহ জপের বিনিময়ে জান্নাত পেতে চাই? আমরা কি পিরের নিরঙ্কুশ সমর্থন আদায় করেই রাষ্ট্রক্ষমতায় যেতে চাই? মূলত আমরা সব সময় সহজ পথে বেশি লাভ পেতে চাই। জনসাধারণ এতে উপেক্ষিত। এটা আমাদের মজ্জাগত ব্যাধি। যদি আমরা কোনো পক্ষকে দমন করেই ক্ষমতায় থাকতে পারি বা যেতে পারি, তবে জনগণের স্বীকৃতি আর পেতে চাইনে। জনগণ তো তাহলে এখানে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে যায়। জন-স্বীকৃতি পেতে তো কাজ করতে হয়, কোষাগার লুটপাট বন্ধ করতে হয়, চাটুবাদ-চাটুবৃত্তি বন্ধ করতে হয়, দেশকে ভালোবাসতে হয়, নিজস্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়, দেশে সুনীতি প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। নির্বাচিত হওয়ার জন্য কাজ ও সুস্থ চিন্তাধারা দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে আসতে হয়। সাধারণ মানুষ তো দুর্নীতিবাজ, প্রতারক, মিথ্যাবাদি, তহবিল তছরুপকারি, ফেরেববাজ, যারা নিজস্ব পিরের কাছে দেশকে বন্ধক রেখে ক্ষমতার স্বীকৃতি

আদায় করে; জনমানুষকে, গণরায়কে উপেক্ষা করে, হেয় প্রতিপন্ন করে– তাদেরকে ভালো চোখে দেখতে পারে না। পারাটা উচিতও নয়। নইলে যে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকা বা আসার জন্য গণরায়কে অবমাননা করে পির ভজন করতে গিয়ে 'কর্তাভজা সম্প্রদায়ে' পরিণত হয়ে গেছে, যা এ জাতির জন্য লজ্জাকর; গ্লানিকরও বটে। সাধারণ মানুষের স্বীকৃতি যেখানে মুখ্য, এসব বাচবিচার যে দেশে আছে– এর নামই গণতন্ত্র। এসবের চর্চা যে দেশে আছে, তারাই তো উপরে উঠে যাচ্ছে। এদেশের রাজনীতিকদের আমলনামা তারা পিরভজন করতে গিয়ে কেজি দরে বেচে খেয়েছেন। প্রতি বছর কোনো এক অমাবস্যার রাতে তারা মুখের লাইসেন্স রিনিউড করিয়ে নেন। কোনো বাড়তি ও হালকা কথাবার্তায় এদের জুড়ি মেলা ভার, এদের কথাভিত্তিক ট্যাক্স দিতে হয় না। তাই এ পির-ভজন তরিকা। এদেশে গণতন্ত্র ও দেশসেবা আনতে গেলে আগে এদের কথা ও কাজ জবাবদিহিতার মধ্যে আনা বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে। রাজনীতিকদের জন্য 'কোড অব এথিক্স' চালু করতে হবে। সংবিধান সংশোধন করতে হবে। বিশ্বের দামি দামি খেলোয়াড়দের জন্য হলুদ কার্ড, লাল কার্ড দেখানোর বিধান আছে। এরা কোনো বিধানমুক্ত থাকবে কেন? জনস্বার্থেই এসব দরকার। এদেশে মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে আনুমানিক সর্ব্বোচ্চ দশ থেকে পনেরো শতাংশ লোক সক্রিয় রাজনীতি করে। এদের রাজনীতিজীবী বলা যায়। এদের অপকর্মের দায় বাকি পঁচাশি শতাংশ জনগোষ্ঠী বহন করবে কেন?

উন্নয়ন নিয়ে কিছুটা বয়ান করি। আমি অনেকবার বলেছি যে, উন্নয়ন অর্থ কোনো অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়। উন্নয়ন অর্থ বসবাসকারি জনগোষ্ঠীর (রাজনীতিক সহ) মানসিকতার উন্নয়ন। মানসিকতার অবনতির কারণে আমাদের কোষাগার দুরবস্থায় ধরেছে। দ্রব্যমূলের ঊর্ধ্বগতি লাগামহীন হয়েছে। আর্থিক লুটপাট হচ্ছে। অশিক্ষা-কুশিক্ষায় দেশ ভরে গেছে। আমরা বিশ্বের নিম্নমানসম্পন্ন দেশের কাতারে ঠাঁই করে নিয়েছি। আমাদের রাজনীতি যেখানে দেশব্যাপী মিথ্যা, কুশিক্ষা, দুর্নীতির প্রশিক্ষণ দেয়, সেখানে সুশিক্ষা আসবে কোত্থেকে? জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়ন হবে কীভাবে? জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নতি না করে শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়ন করলে যে দশা হয়, এদেশ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উন্নয়নের মাপকাঠি বলতে আমি জাতিসংঘ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'সাসটেইন্যাবল ডেভেলপমেন্ট গোলস'কে বুঝি। এখানে সতেরোটা বিষয়ের (দফার) উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া আছে। প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার আবার সাব-দফা আছে। ২০৩০ সালের মধ্যে যা অর্জনযোগ্য। নয় নম্বরে আছে 'ইন্ডাস্ট্রি, ইনোভেশন এ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার'। চার নম্বরে আছে 'গুণগত শিক্ষা'। এক থেকে আট নম্বর দফা বিগত আট বছরে কতটুকু অর্জিত হয়েছে বা অন্য দফাগুলোরই বা অবস্থা কি, তা আমাদের জানার বাইরে। আমরা শুধু 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার' নিয়ে দৌড়াদৌড়ির মধ্যে আছি। আপাতদৃষ্টিতে আমার মনে হয়, আমাদের অবস্থান খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই। আমাকে এ দফাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে বললে আগেই দু-তিনটা নতুন দফার অবতারণা করতাম, যে দফাগুলোর উন্নয়নের অভাবে অনেক দেশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় না। আমাদের দেশের উন্নতির অবস্থাও সেই একই কারণে ভুগছে। কোনো সুহৃদ এ কলামে বাস্তব তথ্য দিয়ে এ বিষয়ে এদেশের প্রকৃত অর্জন তুলনামূলক আলোচনা করলে আমরা উপকৃত হতাম।

আমাদের উন্নয়ন হবেই-বা কেন। আমাদের মৌখিক কথা আছে, অন্তরে ইচ্ছে নেই। লিখিত উদ্দেশ্য আছে, বাজেট বরাদ্দ আছে, বাস্তবায়ন নেই, তাই অর্জন নেই। এর সাথে আরেকটা কথা আছে 'সিস্টেম লস'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রথিতযশা অধ্যাপকের সাথে প্রায় পঁচিশ বছর আগে আমার আলাপচারিতা হচ্ছিল। তিনি একজনের লেখাপড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, 'শুনেছি আন্ডার ম্যাট্রিক'। তিনি আমাকে পাল্টা প্রশ্ন

করলেন, ‘কত ক্লাস আন্ডার’? উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেলাম। আজ যদি আমাকে কেউ প্রশ্ন করেন, ‘এদেশের প্রতিটা সরকারি ও প্রজেক্টের কাজে সিস্টেম লস কত’? আমাকে উত্তরে বলতে হবে, ‘যা কিছু ঘটছে, আপনি তো নিজ চোখেই দেখছেন। আপনি যতটা উচ্চ-মাত্রা অনুমান করতে পারেন, ততই সঠিক’।

(১৯ অক্টোবর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদঃ অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।